The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVIII, 2022 (pp. 243 - 252)
Published in July, 2025

চট্টগ্রাম বিজেতা কদল খান গাজি : একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ রবিউল আলম *

প্রতিপাদ্যসার: বার আউলিয়ার পূণ্যভূমি চট্টগ্রাম সর্বপ্রথম বার আউলিয়ার মাধ্যমেই ইসলামের অনুকূলে বিজয় সাধিত হয়। তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন কদল খান গাজি। তিনি এগারজন বন্ধু দরবেশ ও তাঁদের অনুসারীদের সহযোগিতায় চট্টগ্রামকে মুসলমানদের শাসনাধীন করেন এবং এখানে ইসলাম প্রচার করেন। চট্টগ্রাম বিজয় ও ইসলাম প্রচারে এত ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও তাঁর ততোটুকু পরিচিতি নেই। তদুপরি তাঁর পরিচয়, মাযার, স্মৃতিস্মারক ইত্যাদি নিয়ে ইতিহাসবিদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাই বক্ষমান প্রবন্ধে এসব বিষয়ের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক ফলাফল নির্ধারণে আলোকপাত করা হয়েছে।

ভূমিকা

আজ থেকে শতাধিক বছর আগে এ দেশের পণ্ডিতগণের ধারণা ছিলো যে, প্রাচীনকালে চট্টগ্রাম ভূখণ্ডের অস্তিত্ব ছিলো না; কিন্তু ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড পর্বতে প্রাগৈহাসিক যুগের কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হবার ফলে পণ্ডিতগণের উপর্যুক্ত অভিমত ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে এবং চট্টগ্রাম একটি সুপ্রাচীন অঞ্চল বলে প্রমাণিত হয়েছে। গবেষকরা মনে করেন যে, খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭ সালে চট্টগ্রাম ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনে ছিলো। এ জন্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলিমদের পূর্বে বিভিন্ন অমুসলিম জনগোষ্ঠী বসবাস করতো। ৬২৯-৪৫ খ্রিষ্টাব্দে যখন হিউয়েন সাঙ ভারত ভ্রমণ করেছিলেন, তখন চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাই ছিলো প্রধান সম্প্রদায় এবং এ অঞ্চল ছিলো প্রাগ জ্যোতিষপুর(বর্তমান কামরূপ বা আসাম) রাজ্যের অধীনে। এরপর দীর্ঘকাল চট্টগ্রাম দখল নিয়ে আরাকান ও ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ হয়েছিলো। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে সাহাবি, তাবিয়ি, সুফিসাধক ইসলাম প্রচারের জন্য এবং আরব বণিকগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে আগমন করেন। ফলে তাঁদের মাধ্যমে চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন এলাকায় সীমিতাকারে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায়; কিন্তু মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণে ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটেনি। বার আউলিয়ার সমন্বয়ক মহাবীর কদল খান গাজির নেতৃত্বেই খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে মুসলিমরা সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম বিজয় করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে চট্টগ্রামে ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে।

চট্টগ্রামে মুসলমানদের আগমন

প্রাচীনকাল থেকেই চট্টগ্রামের সামুদ্রিক বন্দরে বিদেশি বণিকদের যাতায়াত ছিলো। চট্টগ্রাম বন্দরের সূত্রে আরব বণিকদের চট্টগ্রাম আগমনের ধারাবাহিকতায় ইসলামের সূচনাকাল থেকেই চট্টগ্রামে মুসলিমদের আগমন ঘটেছিল। রাসুলুলাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মদিনায় হিজরতের আগে তথা মক্কায় অবস্থানকালেই ৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে একদল সাহাবি বাদশাহ নাজাশির দেওয়া জাহাজে করে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সামন্দর (চট্টগ্রাম) বন্দরে এসেছিলেন। তাঁরা সেখানে চার বছর অবস্থান করে চীনে চলে যান। খলিফা হযরত উমরের আমলেও একটি

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

তাবিয়িদের দল চট্টগ্রাম বন্দরে অবতরণ করে বিবিধ জায়গায় ইসলাম প্রচার করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে এরূপ পাঁচটি ইসলাম প্রচারক দল চট্টগ্রাম আগমন করার প্রমাণ পাওয়া যায় (হক ও করিম ৩)।

১৯৮৩-৮৪ খ্রিষ্টাব্দে উত্তরাঞ্চলের জেলা লালমনিরহাটের পঞ্চগড় ইউনিয়নের রামদাস গ্রামে মজদের আড়া নামে একটি টিলা থেকে একটি প্রাচীন শিলালিপি উদ্ধার হয়েছিলো, যার আকার ছিল ৬"×৬"×২" এবং এটির ওপরে আরবিতে স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে- لا إله إلا الله محمد رسول الله 69ه [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুলাহ, ৬৯ হিজরি]। এটি বর্তমানে রংপুরের তাজহাট জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। *টাইগার টুরিজম* প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা টিম স্টিল বৃষ্টিশ ও আমেরিকান প্রত্নতাত্ত্বিকদের সহযোগিতায় ব্যাপক গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, শিলালিপিবিশিষ্ট ইটের ধ্বংসাবশেষগুলো প্রমাণ করেন যে, এগুলো ৬৯ হিজরি বা ৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত প্রাচীন মসজিদের ভগ্নাংশ (রশীদ ও মাহমুদ)। এ শিলালিপিটি আরব্য স্থাপত্যশৈলী ও সভ্যতার স্বাক্ষর বহন করে। কারণ আরবরা শিলালিপি লিখতে অভ্যস্থ ছিলেন। তাছাড়া ওই অঞ্চলে ৬৯ হিজরি বা ৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমান থাকার কথা নয়। তাই এটি প্রমাণ করে যে, ওই অঞ্চলে সাহাবিগণ এসেছিলেন। কেননা, এটি ছিল সাহাবিযুগ। ১২০ হিজরি সাল পর্যন্ত সময়কালকে সাহাবিযুগ হিসেবে বিবেচনা করা হয় (কারি, খ. ৯, ৩৮৭৮)। এ থেকে বোঝা যায় যে, সাহাবিযুগেই এ দেশে চট্টগ্রাম হয়ে ইসলাম ধর্মের আগমন ঘটে। উল্লেখ্য, প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশ এলাকার প্রবেশদ্বার ছিল চট্টগ্রাম বন্দর। এ কারণে সাহাবি-তাবিয়িগণ চট্টগ্রাম হয়েই অন্যান্য অঞ্চলে গিয়েছেন।

মুসলমানদের চট্টগ্রাম বিজয়

ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি বঙ্গ বিজয় করেন ১২০৪-১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে (শাইখ ৬২)। এ হিসেবে চট্টগ্রামে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের ১৩৫-৩৬ বছর পর। কারণ ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে বা এর কাছাকাছি সময়ে চট্টগ্রাম মুসলিম কর্তৃক সর্বপ্রথম অধিকৃত হয়। ড. এনামুল হক বলেন,

> From the history of Shihabud Din Talish, written in the last part of the seventeenth century, we come to know that Chittagong was first conquered in or about the year 1340 A.D. by the Muslims, during the reign of Fakhrud Din Mubarak Shah. This fact is supported by the records of Ibn Battutah's travel to Bengal. He visited Chittagong during the cold weather of 1346-47 A.D. and he saw the port of Chittagong was under the government of Fakhrud Din.
>
> From the above discussion we are perhaps justified to arrive at the conclusion that in the year 1340 A.D. Chittagong was first conquered by the Muslims and the expedition was led by Kadal Khan Ghazi who was probably the general of Fakhrud Din Mubarak Shah. We have seen that Pir Badr was with him and hence he was alive in the year 1340 A.D (250).

অর্থাৎ-সপ্তদশ শতকের শেষপাদে লিখিত শিহাবুদ্দিন তালিশের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দ বা এর কাছাকাছি সময়ে চট্টগ্রাম মুসলিম কর্তৃক সর্বপ্রথম অধিকৃত হয়। এ সময় ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ রাজত্ব করতেন। ইবন বতুতার বাংলাদেশ সফর নামার দলিল-পত্রে এ সত্যের সমর্থন মেলে। তিনি ১৩৪৬-১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দে শীত মৌসুমে চট্টগ্রামে আসেন। তখন তিনি দেখেন যে, চট্টগ্রাম ফখরুদ্দিনে শাসনামল ছিলো। উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম সর্বপ্রথম মুসলমান কর্তৃক

অধিকৃত হয় এবং কদল খান গাজি আক্রমণ পরিচালনা করেন, যিনি হয়ত ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের সেনাপতি ছিলেন। আমরা দেখছি যে, পির বদর তাঁর (কদল খান গাজি) সাথে ছিলেন।

গবেষক আব্দুল হক চৌধুরী বলেন,"ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের সেনাপতি কদল খান গাজি ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানীদের পরাজিত করে চট্টগ্রামকে সোনারগাঁও রাজ্যভুক্ত করেন। কবি মুহাম্মদ খাঁ বিরচিত *মুক্তল হোসেন* (১৬৪৬ খ্রিষ্টাব্দ) কাব্য-সূত্রে জানা যায় যে, আরবদেশীয় বদর আলম চট্টগ্রাম বিজয়ে কদল খান গাজিকে সহায়তা দান করেছিলেন। বদর আলম চট্টগ্রাম অভিযানের আগে এখানে ইসলাম প্রচারে রত ছিলেন" (৪৭)। তিনি অন্যত্র বলেন, "ইবনে বতুতার সফরনামা', শিহাবুদ্দিন তালিশের 'ফতিয়ায়ে ইব্রিয়া' ও কবি মুহাম্মদ খাঁ'র 'মুক্তল হোসেন'(১৬৪৬)কাব্যে বর্ণিত কবির আত্ম- পরিচিতিতে জানা যায় যে, ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন সোনারগাঁ রাজ্যের সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের সেনাপতি কদল খান গাজি বা কদর খাঁ সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম অধিকার করত: সোনারগাঁ রাজ্যভুক্ত করেন" (চৌধুরী ৭)। কবি ওহীদুল আলম সৈয়দ মুরতাজা আলীর সূত্রে বর্ণনা করেন,"কদল খান গাজি ছিলেন সুলতান ফখর উদ্দিন মোবারক শাহের সেনাপতি। তিনিই চট্টগ্রাম জয় করেন" (আলম ১২)। ড. আহমদ শরীফ *চট্টগ্রামের ইতিহাস গ্রন্থে* (৩২), ড.সুখময় মুখোপাধ্যায় *বাংলার ইতিহাস গ্রন্থে* (১৯৬-৯৭), গবেষক মাহবুবুল আলম *চট্টগ্রামের ইতিহাস গ্রন্থে* (৪৭) প্রমুখ গবেষকগণও একই অভিমত প্রকাশ করেন। ড. আব্দুল করিম ও আসকার ইবনে শাইখের মতে, সুফি কদল গাজি ও তাঁর শিষ্য-সঙ্গীরা চট্টগ্রাম এসে স্থানীয় প্রধানদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন (করিম ১৭৪; শাইখ ১১৪)। সুলতান ফখর উদ্দীন মুবারক শাহ তাঁদেরকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন এবং চট্টগ্রাম এলাকা মুসলমানদের অধিকারে আসে। সপ্তদশ শতাব্দির বিখ্যাত কবি মোহাম্মদ খাঁ বিরচিত *মুক্তল হোসেন* গ্রন্থে চট্টগ্রাম বিজয় ও কদল খান গাজি সম্পর্কে বর্ণিত অংশগুলো নিম্নরূপ:

এক মনে প্রণাম করম বারে বার
কদল খান গজী পীর ত্রিভূবনের সার ।।
যাঁর রণে পড়িল অক্ষয় (অসংখ্য) রিপুদল
ভএ কেহ মজ্জি সমুদ্রের তল ।।
একসর মহিম হইল প্রাণহীন
রিপুজিনি চাটি গ্রাম কৈলা নিজাধীন ।।
বৃক্ষডালে বসিলেক কাফিরের গণ
সেই বৃক্ষ ছেদি সবে করিলা নিধন ।।
তান একাদশ মিত্র করম প্রণাম
পুস্তক বাড়এ হেতু না লেখিলু নাম।
তান একাদশ মিত্র জিনিয়া চাটিগ্রাম
মুসলমান কৈলা চাটিগ্রাম অনুপাম ।।
তাহান প্রেমের সখা অতি গুণবান
শএখ শরিফুদ্দিন ত্রিভুবনে জান (করিম ১৯)।।

তবে পিতামহগণ প্রণামি এ একমন
পিতামহ মাহি আছোয়ার
সিদ্দিকের বংশে জন্ম উমরের সদৃশ ধর্ম

লজ্জাএ ওসমান সমসর।।
জ্ঞানেতে সদৃশ আলী দানেতে হাতিম বুলি
হামজা সদৃশ বলবান।
শিক্ষাগুরু কল্পতরু সর্ব অস্ত্র-শস্ত্রে গুরু
জন্ম হৈল আরবের স্থান।।
হাজি খলিল পীর ওর চাহি পৃথিবীর
ফিরিয়া আসিতে আরবার।।
সহরিষে তান সঙ্গে পৃথিবী ভ্রমিতে রঙ্গে
চলি ভেলা মাহি আছোয়ার।
আসিতে সমুদ্র তীর সে হাজি খলিল পীর
সিংহ চর্মে কৈলা আরোহণ।
আল্লার ফরমান পাই এক মৎস্য আইল ধাই
পৃষ্ঠ পাতি দিলা ততক্ষণ।।
আল্লার অস্তুত করি সে মৎস্যর পৃষ্ঠেতে চড়ি
চলি ভেলা মাহি আছোয়ার।
গহন সমুদ্র তরি দুই পীর আইলা চলি
চাটিগ্রাম দেশের মাঝার।।
একাদশ মিত্র সঙ্গে কদল খান গাজি রঙ্গে
দুই পীর বাড়ি লই গেলা ।।
হাজি খলিলকে দেখি বদর আলম সুখী
অন্যে অন্যে বহুল সম্ভাষিলা (করিম ২৪-২৫)।

আলোচ্য কবিতাংশ হতে কয়েকটি বিষয় জানা গেলো। যেমন- এক. কদলখান গাজি প্রমুখ সুফিরা বীরদর্পে চট্টগ্রাম দখল করে স্থানীয় অধিবাসীদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন । দুই. কদলখান গাজি ছিলেন একাধারে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের অন্যতম, সুদক্ষ সেনাধ্যক্ষ, মহাবীর ও পির (সুফি)। তিন. কদলখান গাজিরা যখন চট্টগ্রামে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলেন তখন বিখ্যাত দরবেশ বখতিয়ার মাহি সাওয়ার এবং তাঁর সঙ্গী হাজি খলিল পির আলাইহিমার রহমাহ আরব থেকে চট্টগ্রামে এসে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। চার. হযরত বদর শাহ্, শায়খ শরিফ-উদ-দীন আলাইহিমার রহমাহ প্রমুখ এগার জন বন্ধু-দরবেশ এবং কদল খান গাজি মিলে ঐতিহাসিক বার আউলিয়ায় পরিণত হন।

কদল খান গাজির পরিচয়

কদল খান গাজির জন্ম, মৃত্যু, বংশ, সাংসারিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি; বরং তাঁর জীবনী চট্টগ্রাম বিজয় ও চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারের মধ্যে সীমিত। তিনি কদল খান নামে প্রসিদ্ধ; তবে ইতিহাসবিদের কাছে কদর খান নামেও পরিচিত। সাহিত্যিক মাহবুবুল আলম বলেন, “কেহ্ কেহ্ কদল খাঁকে কদর খাঁ রূপে নির্দেশ করেছেন”(আলম ৪৭)। তিনি কি সেনাপতি ছিলেন নাকি নিছক সুফি ছিলেন-তা নিয়ে ইতিহাসবিদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, তিনি সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের সেনাপতি ছিলেন। কতিপয় স্বনামধন্য ঐতিহাসিকের মতে, তিনি ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের সেনাপতি ছিলেন না; বরং একজন সুফিই

ছিলেন। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের শাসন প্রবর্তন কিংবা ইসলাম ধর্ম প্রচারের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, প্রথমে সুফি-সাধকরা ধর্ম প্রচারের জন্য বের হতেন এবং বিধর্মীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে মুসলমান শাসকরা তাঁদেরকে সাহায্য করতেন অথবা সীমান্তবর্তী হিন্দু রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে সুফিরা মুসলমান সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে যোগ দিতেন। যেমন হুগলী জেলার ত্রিবেণী এলাকা এবং সিলেটে এ রকম পরিস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রিবেণী এবং সিলেট বিজয়ের প্রায় সমকালে চট্টগ্রামেও মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদিক বিবেচনার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, কদল খান গাজি হয়তো ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের সেনাপতি ছিলেন না; বরং একজন সুফি ছিলেন। গবেষক ড.আব্দুল করিম বলেন,

> তিনি এবং তাঁহার সঙ্গী ও শিষ্যরা চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার করিতে আসিয়া স্থানীয় লোকদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হইলে ফখর-উদ-দীন হয়তো তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন এবং এইভাবে চট্টগ্রামে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এব জন্যই হয়তো স্থানীয় প্রচলিত কিংবদন্তীতে কদল খান গাজি ফখর-উদ-দীনের সেনাপতিতে পরিণত হইয়ায়াছেন (করিম ১৭৪)।

অনেকের মতে, তিনি ফখর উদ্দিন মুবারক শাহের সেনাপতি হিসেবে তাঁর সাথীদের নিয়ে অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে চট্টগ্রামকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসেন। পরবর্তী জীবনে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন করে সুফি-সাধকে পরিণত হয়েছেন যেমন বাগেরহাটের খান জাহান আলী। এ প্রসঙ্গে গবেষক ড.আব্দুল করিম বলেন, "এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, কোন সেনাপতির পক্ষে পরবর্তী জীবনে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন অসম্ভব নয়, যেমন ত্রিবেণীর জাফর খান গাজি, বাগেরহাটের খান জাহান আলী এবং রংপুর জিলার কাঁটাদুয়ারের শাহ ইসমাইল গাজি সম্পর্কে অনেকে মনে করিয়া থাকেন"(করিম ১৭৪)। আমাদের জানা মতে, কোনো ব্যক্তি সেনাপতি ও সুফি হওয়া পরস্পরবিরোধী নয়। সাধারণ ব্যক্তি যেমন সেনাপতি হতে পারে, তেমনি সুফিও সেনাপতি হতে পারে। সুফি ব্যক্তি সেনাপতি হওয়াতে কোনো বাধা নেই। যেমন সালাহ উদ্দিন আইয়ুবি রা. প্রমুখ। সুতরাং কদল খান গাজি সুফি হয়েও সেনাপতি হতে কোনো বাধা নেই।

তিনি শুধু একজন সেনাপতি বা সাধারণ সুফিই ছিলেন না; বরং একজন উঁচু পর্যায়ের অলিও ছিলেন। যাঁদের কারণে চট্টগ্রামকে বার আউলিযার পূর্ণভূমি বলা হয়, কদল খান গাজি সেই বার আউলিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ডক্টর আবদুল করিম প্রমুখের মতে, কদল খান গাজি ছিলেন বার আউলিয়ার অন্যতম। বিগত পাকিস্তান আমলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের নেতৃত্বে অনুসন্ধান করে চট্টগ্রামের পটিয়া থানা থেকে অলি-আবদাল সম্পর্কিত একটি পুরাতন আরবি হস্তলিপি সম্বলিত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করা হয়। তাতেও বার আউলিযার নামের মধ্যে কদল খান গাজির নাম পাওয়া যায় (করিম ৭১)। সতের শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি মোহাম্মদ খাঁও *মুক্তল হোসেন* গ্রন্থের বর্ণনা থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বার আউলিয়ার অন্যতম ছিলেন।

কদল খান গাজির সহযোদ্ধাদের পরিচয়

কদল খান গাজির সহযোদ্ধাদের মধ্যে দু'জনের নাম জানা যায়। তাঁরা হলেন- শায়খ শরিফ-উদ-দীন এবং বদর আলম। এ প্রসঙ্গে কবি মোহাম্মদ খাঁ এর অভিমত হলো- কদল খান গাজি পির অসংখ্য রিপুদল পরাস্ত করে চট্টগ্রামে এক আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করেন অর্থাৎ- ইসলাম প্রচার করেন। কদল খান গাজি পিরের সাথে তাঁর একাদশ মিত্র ছিল। কবির ভাষায়-

> তান একাদশ মিত্র জিনিয়া চাটিগ্রাম,
> মুসলমান কৈলা চাটিগ্রাম অনুপাম (করিম ৩৯)।

জনশ্রুতি রয়েছে যে, বারজন আউলিয়া সর্বপ্রথমে চট্টগ্রামে এসে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। এজন্য চট্টগ্রাম 'বার আউলিয়ার দেশ' হিসেবে পরিচিত। কবি মোহাম্মদ খানের সাক্ষ্য এ জনশ্রুতির ঐতিহাসিকতা স্বীকার করতে সাহায্য করে। কবি তাঁর পুস্তিকার কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় বারজন আউলিয়ার নাম উল্লেখ করেননি। কবি শুধু মাতৃকুলের পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর পূর্ব পুরুষ শায়খ শরিফ-উদ-দীনের নাম উল্লেখ করেছেন, যিনি কদল খান গাজির প্রেমের সখা ছিলেন। অর্থাৎ- তিনি বার আউলিয়ার অন্যতম ছিলেন। তিনি পিতৃকুলের পরিচয়কালে বদর আলমের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনিও বার আউলিয়ার অন্যতম ছিলেন। কবি মোহাম্মদ খানের মতে, তাঁর পূর্ব-পুরুষ মাহি সাওয়ার এবং হাজি খলিল আরব দেশ থেকে চট্টগ্রামে আসেন এবং সেখানে কদল খান গাজি এবং বদর আলম ও অন্যান্যদের সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। কবির ভাষায়,

আল্লার অস্তুত করি   সে মৎস্যর পৃষ্ঠেতে চড়ি
চলি ভেলা মাহি আছোয়ার।
গহন সমুদ্র তরি   দুই পীর আইলা চলি
চাটিগ্রাম দেশের মাঝার।।
একাদশ মিত্র সঙ্গে   কদল খান গাজি রঙ্গে
দুই পীর বাড়ি লই গেলা ।।
হাজি খলিলকে দেখি   বদর আলম সুখী
অন্যে অন্যে বহুল সম্ভাষিলা (করিম ৩৯)।।

সুতরাং কবি মোহাম্মদ খানের বংশ পরিচয়ে চট্টগ্রামের বার আউলিয়ার মধ্যে তিনজন-কদল খান গাজি, শায়খ শরিফ-উদ-দীন এবং বদর আলম এর নাম পাওয়া যায়। এতে প্রতীয়মান হয়েছে যে, তাঁরা চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার করেছেন।

কদল খান গাজির স্মৃতি-স্মারক:

চট্টগ্রাম অভিযানকালে কদল খান গাজি তথা ঐতিহাসিক বার আউলিয়াগণ চট্টগ্রাম জেলার রাউজানের কদলপুর নামক গ্রামে শিবির স্থাপনর করে অবস্থান করেন (আলম ৮)। গবেষক আব্দুল হক চৌধুরী বলেন,"মুঘলসূত্রে ও বৃটিশ যুগের জরিপ রেকর্ড 'জুরিডিকশন লিস্ট অব দ্যা ডিস্ট্রিক চিটাগাং' এ কাতালগন্‌জ নামক কোন স্থান বা মৌজার অস্তিত্ব নেই। তবে কদলের স্মারক-নিদর্শনাদি চট্টগ্রামের রাউজান থানায় বিদ্যমান। সেখানকার কদলপুর মৌজা তাঁর নামানুসারে স্থাপিত এবং সেখানে কদলের দীঘি ও বাড়ি আছে"(৪৮)। সাহিত্যিক মাহবুবুল আলমের বর্ণনা মতে, রাউজান থানার কদলপুর গ্রাম ও কদলের দীঘি কদল খান গাজির স্মৃতি বহন করছে (আলম ৪৭)। সীমানা পুনঃনির্ধারণের ফলে বর্তমানে কদলের বাড়ি ও দীঘি কদলপুর গ্রামের বাইরে; কিন্তু বি,এস,জরিপ অনুসারে কদলের বাড়ি ও দীঘি কদলপুর মৌজার অন্তর্ভুক্ত। ড. আহমদ শরীফ প্রমুখের মতে, কদল খান গাজির নামানুসারে চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অন্তর্গত কদলপুর গ্রামের নাম করণ করা হয় (শরীফ ৩২)। কদলপুরের সাথে কদল খান গাজির সম্পৃক্ততার বিষয়ে ' ডিস্ট্রীক্ট গেজেটিয়াস চিটাগাং, ইস্ট পাকিস্তান, ১৯৭০'এ উল্লেখ রয়েছে:

> When Fakra become the independent sultan of Sonargaon and Assumed the tittle of Fakhruddin Mubarak Shah, he Occupied Chittagong... Probably it was during the reign of Arakanere king minhti (1374). Accordng to tradition, Kadal Khan

> Ghazi (Qadr Khan) was a military officer and contem parlay (who came with Mahswar Baktear Siddique) of Fakhruddin, who conquered Chittagong. There is a village named Kadalpur under Raozan Police Station. Maqtul Husain a Bengali Book written in 1654 records that Haji Khalil and Badruddin Allama were engaged in preaching Islam in Chittagong about this time. Kadal Khan Ghazi met Hazi Khalil and Bara Aulia and Allama Baduddin and hononred than (Alam 8).

অর্থাৎ-ফখরু সোনার গাঁয়ের স্বাধীন সুলতান হয়ে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ নাম ধারণ করেন এবং চট্টগ্রাম অধিকার করেন। সম্ভবত এটি আরাকানি রাজা মিনহটির (১৩৭৪) রাজত্বকাল ছিলো। প্রচলিত মতে, কদল খান গাজি (কদরখান) ছিলেন চট্টগ্রাম দখলকারী একজন সামরিক অফিসার এবং ফখরুদ্দিনের সমসাময়িক ব্যক্তি (যিনি মাহি সাওয়ার বখতিয়ার সিদ্দিকের সাথে ছিলেন)। রাউজান থানাধীন কদলপুর নামে একটি গ্রাম আছে। ১৬৫৪ সালে বাংলা ভাষায় লিখিত *মুক্তল হোসেন* নামক পুস্তকের লেখা প্রমাণ করে যে, হাজি খলিল এবং বদরুদ্দিন আল্লামা সেই সময় চট্টগামে ইসলাম প্রচারে রত ছিলেন। কদল খান গাজি হাজি খলিল, বার আউলিয়া ও আল্লামা বদরুদ্দিনের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সম্মান প্রদর্শন করেন। কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে, তিনি 'কদলপুর' নামক এলাকা জায়গীর হিসাবেও পেয়েছেন (চৌধুরী ৪৮)।

উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক বর্ণনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, চট্টল বিজেতা সেনাপতি ও বার আউলিয়ার অগ্রজ সুফি কদল খান গাজির নামানুসারে চট্টগ্রামের রাউজান থানার ঐতেহ্যবাহী গ্রাম কদলপুরের নামকরণ করা হয়েছে। জ্ঞাতব্য যে, চট্টল বিজেতা সেনাপতি সুফি কদল খান গাজি কদলপুর নামক যে গ্রামের গোড়াপত্তন করেছেন এবং তাসাউফের দীপ-শিখা প্রজ্জ্বলিত করে গেছেন, সে কদলপুর গ্রাম এখনো একটি আধ্যাত্মিক গ্রাম হিসেবে পরিচিত। এ গ্রামে হযরত শাহ্ আশরাফ (রা.), হযরত আবু শাহ (রা.), ফারসি বিশারদ হযরত মুন্সী মেহের উল্লাহ (রা.), হযরত আজিজুল হক শাহ্ (রা.), হযরত শাহ্ আব্দুল আজিজ (রা.), হযরত চাঁদ শাহ্ (রা.), হযরত মুহাম্মদ জমান শাহ (রা.), হযরত মিয়া শাহ্ (রা.) প্রমুখ আউলিয়ায়ে কিরামের মাযার শরিফ বিদ্যমান। যার ফলে উক্ত কদলপুর গ্রামে অসংখ্য পূর্ণাথীর আগমন ঘটে। উল্লেখ্য, গবেষক আব্দুল হক প্রমুখের মতে, কদল খান গাজির বন্ধু-দরবেশ হাজি খলিল পীরের নামানুসারে কদলপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম খলিলাবাদের নামকরণ করা হয়।

কদল খান গাজির সমাধিঃ

কদল খান গাজির সমাধিস্থান নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। ড. আবদুল করিম প্রমুখের মতে, কদল খান গাজি এবং কাতাল শাহ একই ব্যক্তি (করিম ৭৬)। তিনি বলেন, "চট্টগ্রামে কদল খান গাজি ও পির বদর আলমের সমাধি ভবন দৃষ্ট হয়। চট্টগ্রামের একটি এলাকা কদল খান গাজির নামনুসারে কাতালগঞ্জ নামে পরিচিত"(করিম ১৭৪)। তাঁর মতে, কদল খান গাজির প্রকৃত নাম কাতাল শাহ। এজন্য এ এলাকার নাম কাতালগঞ্জ। এটি তাঁর পরবর্তী মত। আবদুল মান্নান তালেব বলেন,

> কাত্তাল পীরঃ চট্টগ্রাম শহরের উত্তর দিকে এ দরবেশের মাজার অবস্থিত। স্থানীয় জনগণের মধ্যে তিনি কাতাল পীর নামে পরিচিত। এ নামের কারণে ঐ স্থানের নামকরণ হয়েছে কাতালগঞ্জ। জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, তিনি শাহ বদরের সঙ্গী ছিলেন। সম্ভবত মগদের সাথে যুদ্ধে অসীম বীরত্বের কারণে তিনি 'কাত্তাল' উপাধি লাভ করেন। আর 'কাত্তাল' শব্দটিই মূলত যুদ্ধ, জিহাদ ও হত্যা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই 'কাত্তাল' শব্দটি যে পূর্ববর্তী 'কদল' কাতালে পরিণত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই (তালেব ১০৮)।

আমাদের মতে, তাঁর এ অভিমত সঠিক হতে পারে না। কারণ, 'কাতাল' শব্দটি মূলত আরবি শব্দ। এটি 'কাত্তাল' শব্দের পরিবর্তিত রূপ। এটি গুণবাচক শব্দ, যার অর্থ অধিক হত্যাকারী। তিনি অসংখ্য শত্রুদেরকে হত্যা করেছেন বিধায়, তাঁর উপাধি 'কাত্তাল। পরে 'কাত্তাল' শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে 'কাতাল' এ পরিণত হয়। পক্ষান্তরে কদল খান গুণবাচক শব্দ নয়; বরং নামবাচক শব্দ। এ প্রসঙ্গে বাংলা পিডিয়ায় রয়েছে, "চট্টগ্রাম শহরের উত্তর দিকে কদল খান গাজির মাজার আছে। স্থানীয় জনগণের মধ্যে তিনি 'কাতাল' বা কাত্তাল নামে পরিচিত। সম্ভবত কদল খান মগদের সঙ্গে যুদ্ধে বহু শত্রুের শিরচ্ছেদ করে কতল (অর্থ শিরচ্ছেদ) আখ্যাপান এবং আঞ্চলিক উচ্চারণে হয়েছে কাতাল"(বাংলা পিডিয়া, খ. ২, ১৩৭)।

চট্টল গবেষক আব্দুল হক চৌধুরীর মতে, কদল খান ও কাত্তাল শাহ একই ব্যক্তি নন; বরং দু'জন স্বতন্ত্র অলি এবং কাতাল শাহের নামেই কাতালগঞ্জ নামকরণ করা হয়েছে। কারণ, কাতালগঞ্জ নাম করণ হয় ১৯৩০ সালের পর। যদি কদল খান গাজির নামানুসারে কাতালগঞ্জের নামকরণ করা হতো, তাহলে তা ১৯৩০ সালের আগে হতো। কারণ, কদলখান গাজি চৌদ্দ শতকের মানুষ ছিলেন। যেহেতু, কাতালগঞ্জের অস্তিত্ব মুঘল সূত্রে ও বিট্রিশ যুগের জরিপ 'রেকর্ড জুরিসডিকশন লিষ্ট অব দ্যা ডিস্ট্রিক্ট চিটাগাং' এ পাওয়া যায় না, সেহেতু কাতালগঞ্জের নাম কারণ ঊনবিংশ শতকে। কাতাল শাহ যদি কদল খান গাজিই হতো, তাহলে ঐতিহাসিক শিহাব উদ্দিন আহমদ তালিশ 'ফতিয়াই ইব্রিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করতেন। কিন্তু তিনি বদর শাহের কথা উল্লেখ করলেও কদল খান গাজির নাম উল্লেখ করেননি (চৌধুরী ১১৬)।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, কদল খান গাজি ও কাতাল শাহ দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি প্রমাণে আবদুল হক চৌধুরীর যুক্তি যথাযথ নয়। কারণ, কাতালগঞ্জের নামকরণ যদি কদল খান গাজির গুণবাচক নাম 'কাত্তাল' অনুসারে হয়, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। কোনো স্থানের নামকরণ কোনো ব্যক্তির নামানুসারে অনেক দিন পরও হতে পারে, যেমন শাহ জালাল আলাইহির রাহমাহ্'র ওফাতের অনেক বছর পর তাঁর নামানুসারে 'শাহ জালাল বিমান বন্দর'র নামকরণ করা হয়। শাহ আলি বোগদাদি আলাইহির রাহমাহ্'র ওফাতের শতশত বছর পর ঢাকার মীরপুরের একটি থানার নামকরণ করা হয় 'শাহ আলী' থানা। অনুরূপভাবে কদল খান গাজির উপাধি অনুসারে তাঁর ওফাতের অনেক বছর পর কাতালগঞ্জ নামকরণ হওয়া সম্ভব। আর শিহাব উদ্দিন তালিশ বদর শাহ এর সাথে কদল খান গাজির সমাধির কথা অনুল্লেখের কারণে প্রমাণ হয় না সে, কদল খান গাজিই কাতাল শাহ ছিলেন না। আর অনুল্লেখ অস্বীকারকে প্রমাণ করে না।

কাতালগঞ্জের কাতাল শাহ এর ছোট দরগাহ ভবনের সমাধিস্থানের উপরিভাগের আকৃতি দেখতে একটি ছোট ছেলের কবরের মতো মনে হয়। একটি ১০/১২ বছরের বালকের কবর কী করে বয়োবৃদ্ধ কাতাল শাহ এর কবর হতে পারে, এ বিষয়ে গবেষক আবদুল হক চৌধুরী ড. আহমদ শরীফকে প্রশ্ন করে ছিলেন। তিনি প্রশ্নের জবাবে বলেন,

> এ কবরটা সম্ভবত কোনো মাদারিয়াপন্থী সুফি-সাধকের কবর। প্রাচীনকালে মাদারিয়া মতবাদের সুফি-সাধকের মৃতদেহ পদ্মাসনে বসানো অবস্থায় দাফন বা কবরস্থ করা হতো যেমন যোগীদের (নাথ সম্প্রদায়) মৃতহেদ দক্ষিণমূখী করে পদ্মাসনে বসানো অবস্থায় গোর দেওয়া হয়। সম্ভবত কাতাল শাহকেও এভাবে দাফন করা হয়েছিল বলে তাঁর কবরটিও দেখতে ছোট দেখা যায়। সম্ভবত চট্টগ্রামের এই মাদারিয়া সুফি সাধক কতল (নিহত) হয়েছিলেন বলে কাতাল পীর বা কাতাল শাহ নামে খ্যাত হয়েছিলেন (চৌধুরী ১১৬-১৭)।

ড. আহমদ শরীফের এ কথার সাথে আমরা দ্বিমতপোষণ করি। কারণ সমাধির উপরিভাগ দ্বারা সমাধিস্থ ব্যক্তির পরিমাপ করা যায় না। অনেক সময় দেখা যায়, সমাধির ওপর একটি পাথর বা অন্য কিছু দ্বারা সমাধির চিহ্ন রাখা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সমাধির ওপরে একটু করে মাটি উঁচু করে দেয়া হয়। আবার অনেক সময় ওপরে কোনো কিছু রাখা হয় না; বরং সমান করে দেয়া হয়। তাই উপরে ছোট হলে সমাধিস্থ ব্যক্তি ছোট হওয়া বুঝায় না। আবার অনেক সময় সমাধির অলংকারিকরূপ বৃদ্ধি করার জন্য সমাধিস্থ ব্যক্তি থেকে সমাধিকে দ্বিগুণ বা ততোধিক বৃদ্ধি করা হয়। আর ইসলামে বসিয়ে দাফন করার বিধান নেই; বরং মৃত ব্যক্তিকে কিবলামুখী করে শুইয়ে দিয়ে দাফনস্থ করাই ইসলামিক বিধান (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, খ. ১, ১৬৬)। তাই কোনো আল্লাহর অলি তো দূরের কথা; বরং কোনো সাধারণ মুসলিমকে বসিয়ে দাফন করার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং কাতাল শাহকে বসিয়ে দাফন করানো কল্পনা করা যায় না। যা-ই হোক, কাতাল শাহ ও কদল খান দু'জনই একই ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নয়। তবে দু'জনই ভিন্ন ব্যক্তি হওয়ার সম্ভবনাও রয়েছে। কেননা, ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অনেক আউলিয়ায়ে কিরাম বা ইসলাম প্রচারকগণ এক স্থানে ইসলাম প্রচার করার পর সেখান থেকে অন্যস্থানে গিয়ে ইসলাম প্রচারে রত হন অথবা নিজ মাতৃভূমিতে চলে গিয়ে ইসলামের খেদমতে আজীবন নিয়োজিত থাকেন। যেমন বখতিয়ার মাহী সাওয়ার সিদ্দিকি ও হযরত সাইয়িদ আব্দুল হামিদ বাগদাদী আলাইহিমার রাহমাহ্ আপন দায়িত্ব শেষ করার পর তাঁদের নিজ নিজ মাতৃভূমিতে চলে যান। হতে পারে কদল খান গাজিও উপরিউক্ত ইসলাম প্রচারকদের মত নিজ মাতৃভূমি অথবা অন্য কোন স্থানে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় ইন্তেকাল করেন এবং সেখানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

আমাদের বিশ্বাস, চট্টগ্রামের কাতালগঞ্জে কাতাল পির খ্যাত সমাহিত ব্যক্তিটি কদল খান গাজি ছাড়া অন্যজন হওয়ার সম্ভবনা অধিক। কেননা সাধারণত পরিলক্ষিত হয়, যে নির্দিষ্ট অলি দ্বারা যে শহর বা দেশে ইসলামের আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, সে অলির মাজার শরিফ সে এলাকার লোকদের নিকট অতীব প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত স্থান হিসেবে পরিগণিত হয় এবং ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক যুগের মানুষের কাছে তাঁর প্রসিদ্ধি ও ভক্তি স্থায়ী থাকে। যেমন- সিলেটের হযরত শাহ জালাল আলাইহির রাহমাহ্, রাজশাহীর শাহ মাখদুম আব্দুল কুদ্দুস রূপোস আলাইহির রাহমাহ্, বাগেরহাটের হযরত খান জাহান আলী আলাইহির রাহমাহ্ প্রমুখ সুফিগণ উল্লিখিত এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন এবং তাঁদের মাজারসমূহ নিজ নিজ এলাকায় প্রসিদ্ধ, যা সব সময় লোকে লোকারণ্য থাকে; কিন্তু কাতাল পীরের মাজার শরিফখানি উপর্যুক্ত মাজার শরিফ সমুহের সম্পূর্ণ বিপরীত। অত্র প্রবন্ধ পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, কদল খান গাজি (রা.) একাধারে ইসলামী সেনাপতি, সুফি ও ইসলাম প্রচারক ছিলেন। সুতরাং তিনি ইসলামের আলো বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে অন্য কোনো দেশে গমন করা অথবা দায়িত্ব শেষে মাতৃভূমির টানে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার সম্ভবনা অধিক বলে মনে হয়।

উপসংহার

মোট কথা বিখ্যাত পর্যটক ইবন বতুতা বিরচিত *তোহফাতুন নাজ্জার* সপ্তদশ শতকের প্রসিদ্ধ মুঘল ঐতিহাসিক শিহাব উদ্দিন তালিশ রচিত *ফতিয়ায়ে ইব্রিয়া* ও সপ্তদশ শতকের প্রখ্যাত কবি মোহাম্মদ খাঁ রচিত *মক্তুল হোসেন* (১৬৪৬ খ্রি.) গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয়ে গবেষকরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দ বা এর কাছাকাছি সময়ে মহাবীর সুফি কদল খান গাজি ১১ জন বন্ধু দরবেশ ও তাঁদের অনুসারীদের সহযোগিতায় জলে-স্থলে অগণিত আরাকানি শত্রু-সেনাদের পরাস্ত করে মুসলমানদের অনুকূলে সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম অধিকার করেন এবং তা সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন। পরিশেষে বলা যায় যে, ঐতিহাসিক

গ্রহণযোগ্য মতে কদল খান গাজি (রা.) হচ্ছে মুসলিমদের মধ্যে সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম বিজেতা এবং তাঁর নেতৃত্বে ব্যাপকভাবে চট্টগ্রামে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসার লাভ করে। বলা বাহুল্য, ষোড়শ শতাব্দির শেষপাদে আরাকানিরা সর্বশেষ চট্টগ্রাম দখল করলে, (চট্টলবাসীকে নির্যাতন থেকে সুরক্ষা ও ভ্রাতৃ হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ) সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেবের নির্দেশে বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খাঁর পুত্র বুজুর্গ উমেদ খাঁর নেতৃত্বে ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি দীর্ঘ প্রায় ৮৫ বছর পর পুনরায় দক্ষিণের কিছু অংশ ব্যতীত চট্টগ্রাম মুসলমানদের দখলে আসে এবং তা মুঘল সাম্রাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর সম্রাট আলমগীরের নির্দেশে চট্টগ্রামের নাম রাখা হয় ইসলামাবাদ (চৌধুরী ১৫-১৬)। ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে ৫ জানুয়ারি ইংরেজরা চট্টগ্রাম দখল নেয়ার আগ পর্যন্ত প্রায় সুদীর্ঘ ৯৫ বছর চট্রগ্রাম নিরবিচ্ছন্নভাবে মুসলমানদের শাসনাধীন ছিলো (চৌধুরী ৩১)। এরই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রামে মুসলিমরা এখনো সংখ্যাগুরু জাতি হিসেবে অধিষ্ঠিত রয়েছে।

তথ্যসূত্র

আলম, মাহবুবুল। *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল*। নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৬৫।

আলম, কবি ওহীদুল। *চট্টগ্রামের ইতিহাস*। আলমবাগ প্রাকশনী, ১৯৮২।

কারি, আলি ইবনু মুহাম্মদ। *মিরকাতুল মাফাতিহ*। দারুল ফিকর, ৯ খণ্ড, ২০০২।

করিম, ড. আব্দুল। *চট্টগ্রামে ইসলাম*। ইতিহাস পত্রিকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

---। *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭।

---। *হযরত শাহ আমানত খান*। প্রকাশনা অনুল্লিখিত, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ।

চৌধুরী, আখতার আলম। *প্রগতি*। কদলপুর প্রগতি সংসদ, ১৯৮১।

তালেব, আব্দুল মান্নান। *বাংলাদেশ ইসলাম*। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২।

মুখোপাধ্যায়, ড. সুখময়। *বাংলার ইতিহাস (১২৪০-১৫৭৬)*। খান ব্রাদাস এন্ড কোম্পানী, ২০০০।

রশীদ, কাজল; মাহমুদ, ইফতেখার। "সাড়ে তেরো শ বছর আগের মসজিদ।" *প্রথমআলো*, ১৯ অক্টোবর, ২০১২, অন্য আলো।

শরীফ, ড.আহমদ। *চট্টগ্রামের ইতিহাস*। আগামী প্রকাশনী, ২০০১।

শাইখ, আসকার ইবনে। *মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা*। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,২০০৪।

শাইখ নিজাম প্রমুখ। *আল- ফাতাওয়া আল্ হিন্দিয়া*। দারুল ফিক্‌র, ১৪১১হি.।

সম্পাদনা পরিষদ। *বাংলা পিডিয়া*। এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৩।

চৌধুরী, আব্দুল হক। *চট্টগ্রাম-আরাকান*। কথামালা প্রকাশনা, ১৯৮৯।

---। *বন্দর শহর চট্টগ্রাম*। বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

---। *চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ*। বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬।

হক, ড. এনামুল। *এ হিস্ট্রি অব সুফিজম ইন বেঙ্গল*। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৯৭৫।

হক, ড. এনামুল ও করিম, আব্দুল সাহিত্য বিশারদ। *আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য*। প্র. অনু., ১৯৩৫।

হক, এম. এ. নুরুল। *বৃহত্তর চট্টল*। প্র. অনু., ১৯৭৭।